International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

উনিশ শতকের সূচনাকালে বাংলার সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা

সওকত আলি সা, গবেষক,
ডক্টর তনুশ্রী ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, সি. এম. জে. বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা:

উনিশ শতকের শুরুতে সমাজের অবস্থা মোটামুটিভাবে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থারই অনুরূপ ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিপুল সম্ভাবে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায় তা বিশেষ আহ্লাদজনক নয়। একদিকে ধনীর বিলাসিতা, পায়রা ওড়ানো, ভোগ ব্যসনের বর্ণময় চিত্র ধনপতি, চাঁদ সদাগর এদের বর্ণনায়। অপরদিকে অপরিসীম দারিদ্র্য ও ক্ষুধাকে সঙ্গী করে জীবনধারণ করে সাধারণ মানুষ। ব্যাধ কালকেতুর কাহিনীতে রয়েছে তারই পরিচয়। ধনীগৃহের কন্যা সন্তানেরা বিবাহপূর্বকালে কিছু লেখাপড়া পিতৃভবনে শিখলেও স্ত্রী শিক্ষার সার্বিক প্রচলন ছিল না বললেই হয়। তারই ফলস্বরূপ সাহিত্যের নারীচরিত্রগুলিরও নৈতিক অবনমন ঘটেছে। স্বামীর জাল চিঠি দেখিয়ে খুলনাকে অত্যাচার করতে লহনার তাই বিবেকে বাধে না। ধনীগৃহের ঘরণীদের মধ্যে কোন্দল বাধানো বা বাজারের অর্থ থেকে কিছু চুরি করাই তাই দুর্বলা দাসীর জীবনের চূড়ান্ত মোক্ষ। তা ছাড়া অশিক্ষার জন্যই রয়েছে কুসংস্কার দীর্ণ মানসিকতা। সতীনের ঘরে বিবাহের পর মেয়ের সুখ সৌভাগ্যকে সুরক্ষিত করতে অথবা বিগতযৌবনার পতিকে অঞ্চলবদ্ধ করতে তুকতাক ঝাড়ফুঁকের উপর অগাধ বিশ্বাস মধ্যযুগীয় নারীকে অবশ্যই মহীয়সী করে তোলে নি। ধনপতির প্রৌঢ় বয়সে দ্বিতীয় বিবাহ কেবল মধ্যযুগীয় ঘটনা নয়, উচ্চবিংশ শতকেও এর অজস্র উদাহরণ আছে। শ্রীমন্তের দুই বিবাহেও কোন ন্যায় বোধের প্রশ্ন জাগেনি, বরং কাহিনীর মধুরেণ সমাপয়েৎ ঘটেছে।

মুল বিষয়বস্তু:

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার জাতিভেদ প্রথার মূলে আঘাত করেছিল। তিনি আজিচণ্ডাল সকলকেই হরিনামামৃত বিতরণ করতেন। এমনকি মুসলিমও তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। যখন হরিদাস তার প্রমাণ, নারীদেরকেও তিনি কিছুটা সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা, সীতাদেবী, জাহ্নবী দেবী এঁরা বৈষ্ণব আচার্যার সম্মান পেয়েছিলেন। এদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষিতা। কেউ কেউ পদ রচনাও করেছিলেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব গুরুদের পত্নীরা 'মা গোসাই' নামে অভিহিত হতেন এবং যজমান বা শিষ্যদের বাড়িতে অন্দরমহলে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ করতেন। অন্তঃপুরচারী নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে উপদেশ ও শিক্ষাদান এদের একটি কর্তব্যকর্ম ছিল। একারণেই সম্ভবত উনিশ শতকের সূচনায় নারীশিক্ষার সামগ্রিক নৈরাশ্যজনক চিত্রে বৈদান্ত্রীরা ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রম।

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার জাতিভেদ প্রথার মূলে আঘাত করেছিল। তিনি আজিচণ্ডাল সকলকেই হরিনামামৃত বিতরণ করতেন। এমনকি মুসলিমও তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। যখন হরিদাস তার প্রমাণ, নারীদেরকেও তিনি কিছুটা সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা, সীতাদেবী, জাহ্নবী দেবী এঁরা বৈষ্ণব আচার্যার সম্মান পেয়েছিলেন। এদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষিতা। কেউ কেউ পদ রচনাও করেছিলেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব গুরুদের পত্নীরা 'মা গোসাই' নামে অভিহিত হতেন এবং যজমান বা শিষ্যদের বাড়িতে অন্দরমহলে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ করতেন। অন্তঃপুরচারী নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে উপদেশ ও শিক্ষাদান এদের একটি কর্তব্যকর্ম ছিল। একারণেই সম্ভবত উনিশ শতকের সূচনায় নারীশিক্ষার সামগ্রিক নৈরাশ্যজনক চিত্রে বৈদান্ত্রীরা ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রম।

এতো গেল বাস্তব সংসারের কথা। বৈষ্ণবসমাজে কিন্তু ধূলিমলিন সমাজের চিত্র বিশেষ নেই। সেখানে রয়েছে পরম আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণ ও আরাধিকা রাধিকার মিলন বিরহের লীলাগান। তবুও এই ভাবলোকের রস পরিমন্ডলের বাইরে যেটুকু সমাজের ছোঁয়া রয়েছে সেখানে দেখা যায় সুন্দরী যুবতী রাধা নপুংসক স্বামী আইহনের ঘরণী। সামাজিক অনুশাসন অনুযায়ী সে বুলবধূ। তাই সতীত্ব রক্ষা ও কুলধর্ম রক্ষাই তার ধর্ম। তারও পরে রয়েছে শাশুড়ী ননদীর জ্বালা। ফলে ভাগিনেয়

কৃষ্ণের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় ও সামাজিক গঞ্জনা। রাধাচরিত্রের এই সামাজিক প্রেক্ষাপট তৎকালীন সমাজে নারীর দুর্দশাপূর্ণ অবস্থানকে চিহ্নিত করে।

সপ্তদশ শতকের 'লোর চন্দ্রাণী' র আখ্যানেও সেই পুরুষের অন্যাসক্তি। অষ্টাদশ শতকের প্রতিনিধিস্থানীয় কাৰা অন্নদামঙ্গল। রাজদরবারের বিলাসকলা ও ব্যভিচারিতার সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে এ গ্রন্থে নারীগণের পতিনিন্দায় সেই বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাস। শিব পার্বতীর বিবাহে সেই বৃদ্ধ বরের হাতে অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীদানের রীতি। কৌলীন্য প্রথার বিষময় রূপ ফুটে উঠেছে চণ্ডীমঙ্গলের এই পংক্তিগুলিতে

আর রাখা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।।
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই ।।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও মোটামুটিভাবে সমাজের এই একই অবস্থা ছিল। কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সপত্নীসমস্যা উনিশ শতকীয় সমাজকে যেমন কলুষিত করেছিল তেমনি শিক্ষাহীনতা ও অবরোধ প্রথা নারীর মর্যাদাকে শূন্যের কোঠায় উপনীত করেছিল। তারপরে ছিল শহর কলকাতার বাবু কালচার। বাবুদের ব্যভিচার ও বিলাসিতার পঙ্কিল স্রোতে সমস্ত নগর সমাজ কলুষিত হয়ে উঠেছিল। বাবুদের বাইনাচ, নৌকা করে বিলাসভ্রমণ, বাগানবাড়িতে বা অন্যত্র বারাঙ্গনা গমন, বুলবুলির লড়াই ও বানরের বিয়েতে লক্ষ টাকা ব্যয় সামাজিক মর্যাদার সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রক্ষিতা রাখাটা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। এই বাবুদের সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রামতনু পলাহিড়ী ও তৎকালীন বাসসনারা গ্রন্থে বলেছেন, "এইসময় শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে একশ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিলো। তাহারা পারসী ও স্বপ্ন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, মুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, সমাজ, দীপ প্রভৃতি বাজাইয়া কৰি হাগ- আড়াই চাল প্রতিনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলযে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং বড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রকৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাপনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিত ।

এই বাবুদের ব্যভিচারিতা ও বিলাসিতা, চারিপাশে চাটুকারদের ভীড় এবং আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার চিত্র এঁকেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববাবুবিলাস'- এ।

বেশ কিছু পরে বঙ্কিমচন্দ্রের রসরচনা তে এদের বর্ণনা আরও জীবন্ত। মদ্যপান ছিল এই বাবুসমাজের অঙ্গ। বঙ্কিমী ভাষায়, "যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মুনিবসাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু।" বস্তুতপক্ষে মদ খাওয়াটা চিরাচরিত হিন্দু সমাজব্যবস্থায় নিন্দনীয় বলেই গণ্য হত। কিন্তু ইংরেজদের এদেশে আগমনের পর আলোচ্য শতকের সূচনায় মদ্যপান সম্পর্কে সেই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটাই পরিবর্তিত হয়। ইয়ংবেঙ্গল দলের সদস্যরাতো মদ খাওয়াকে সমাজসংস্কারের একটা অন্যতম অঙ্গ বলে মনে করতো। পানাসক্তি এই সময় সমাজে এক অন্যতম সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। সমসাময়িক অনেক প্রহসন ও নাটকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবলমাত্র মদ্যপানই নয়, শহরে গাঁজার আড্ডাও ছিল। ধনীঘরের সন্তানেরা অনেকেই এইসব গাঁজার আড্ডায় এসে যোগ দিত। বৌবাজারের এমনই এক গাঁজার দলের নাম ছিল 'পক্ষীর দল'। এই দলের সমস্ত সদস্যদের এক একটি পানীর নামে নামকরণ করা হত। এদের নেতা ছিল রূপচাঁদ পক্ষী। এ ভাবে মাদকাসক্তি সমাজদেহে দুষ্ট ক্ষতের মতোই বাসা বেঁধেছিল। ষোড়শ "শতকে 'চৈতন্য ভাগবত'- এ বৃন্দাবন দাস বলেছিলেন-

ধর্ম কর্ম লোকে সব এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।

ধর্মের মূল অর্থ ভুলে গিয়ে লৌকিক আচার বিচারের গন্ডীতে তাকে আবদ্ধ করে রাখার এই মানসিকতা উনিশ শতকেও ছিল। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে সে সময়কার ধর্মবোধ সম্পর্কে যে চিত্র পাওয়া যায়,তাতেও এই পূজা বলিদানের বাহ্যিক আড়ম্বর ও আচার বিচারই প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্নের ছোঁয়াছুঁয়ির উপর নির্ভর করে বিচার হত পাপ পুণ্যের। আর যত পাপই কেউ করুক গঙ্গাস্নান, তীর্থভ্রমণ ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, অনশন ইত্যাদির দ্বারা তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, এই ছিল প্রচলিত ধারণা। এই বোধ একদিকে যেমন ব্রাহ্মণদের স্বার্থসিদ্ধি করত তেমনি অন্যায় কার্য সংঘটনে ধনীদের প্রশ্রয় দিত। অর্থের বিনিময়ে সমাজের ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণশ্রেণী:যে কোন পাপ থেকে মুক্তির উপায় বাতলে দিত। ফলে ধনী ও উচ্চবর্ণের মানুষেরা যেটা নির্ধারণ করতেন সেটাই হত সমাজবিধান সম্পর্কে শেষ কথা।

কলকাতা শহরের পত্তনের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত যে বিত্তবান মুৎসুদ্দি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তার ফলে, বংশকৌলীন্যের চাইতেও অর্থকৌলীন্য বড় হয়ে উঠেছিল। বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করে সাধারণত নিম্নবর্ণের মানুষরাই ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসেছিল এবং

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

সামান্য ইংরাজী শিখে আমলা হয়ে অর্থ উপার্জন করেছিল। এ প্রসঙ্গে কালী প্রসন্ন সিংহ তাঁর হুতোম প্যাঁচার নকশা' র লিখেছেন। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনসী, ছিরে বেনে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। রামা মুফরাস, কেষ্টা বাগদি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো। অর্থই যে তখন সমাজে ক্ষমতার চাবিকাঠি এর আরও ভালো প্রমাণ 'বালীপ্রসাদী হেঙ্গাম'। এক মুসলিম। উপপত্নী রাখার দোষে হাটখোলার দত্তবংশীয় কালীপ্রসাদ দত্ত জাতিচ্যুত হয়। এই ঘটনার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর জলঘোলা হয়। কালীপ্রসাদের পক্ষ নিয়ে এইসময় রামদুলাল সরকার অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছিলেন এবং বলেছিলেন। জাতি আমার বাক্সের ভিতর।" এর থেকে বোঝা যায়, বর্ণ নয়, অর্থই তখন থেকে সমাজের মূল চালিকাশক্তি রূপে। নির্ঝরিত হয়ে গেছে।

এই সামাজিক পরিবেশে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় নারীর সামাজিক অবস্থান কি ছিল, মানুষ হিসেবে কতটুকু অধিকার বা মর্যাদা তারা পেতেন, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তারা কি ভাবতেন অথবা আদৌ কিছু ভাবতেন কি না- এ বিষয়ে সাহিত্যিক প্রমাণ আমরা বিশেষ পাই না। এই যুগসন্ধির সাহিত্য হল কবিগান। কবিগানে সমাজ চেতনা বা নতুন চিন্তাভাবনার পরিচয়ের পরিবর্তে পুরাতন রাধাকৃষ্ণ লীলারই অনুবর্তন ঘটেছে বেশী। তবু এর অনেক পদে নারীর মনোবেদনা, প্রেমের প্রতিদানে নৈরাশের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন রামবসুর মনে হল সই মনের বেদনা', অথবা রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবুর শুন শুন অর্থানী নেরে নিয়ে হইয়ো না' ইত্যাদি পদে নারীর হৃদয়বেদনার প্রকাশ ঘটেছে। দাম্পত্য জীবনে নারীর অবস্থান তোমায় ছিল তাও কিছুটা অনুমান করা যায় রাম বসুর এই গানটি থেকে-

আজ শুনলাম সই
প্রাণনাথের প্রাণনাথ আছে একজন
নতুন কুমুদ পেয়ে সুনে
আমোদ করেন তিনি
আমার প্রাণ চকোরের হল হুতাসে মরণ।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান হলেও এতে যে সমসাময়িকতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া পড়েনি তা বলা যায় না। দাম্পত্য জীবনে যে একনিষ্ঠতা স্ত্রীর পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক, স্বামীর পথে তা ছিল মৈণতার

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

পরিচয়। বহু পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা তার স্বামীর সম্পর্কে যে উক্তি করেছে, তাতে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাই পুরুষের বহুগামিতা ছিল বিবাহিতা নারাদের মনোবেদনার অন্যতম কারণ। রাম বসুর সমসাময়িক মহিলা কবি শ্বরীর রচনায় সেই মনোবেদনার অন্তরঙ্গ ছবি রয়েছে-আমি কলবর্তী নারী।

উপসংহার

নির্যাতন, অবমাননাকর অবস্থান থেকে প্রচলিত সামাজিক ছক ভেঙ্গে নারীকে তার পুরুষনির্ধারিত গন্ডী পার হতে সাহায্য করেছিল কিছু নারীকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন, যার প্রধান হোতা ছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। A তবে শুধু আন্দোলনই নয়, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সামগ্রিকভাবে নারীর চিন্তা চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে, মননকে সমৃদ্ধ করতে ও নিজেকে প্রকাশ করতে সর্বাধিক সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি নাম করতে হয় ড্রিংকওয়াটার বেথুনের। এই সমস্ত নারীকেন্দ্রিক আন্দোলন ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রভাব যেমন পড়েছিল সমকালীন সমাজে, তেমনি পড়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। এরই ফলে পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে নারী ব্যক্তিত্বের ক্রম জাগরণের পরিচয়।

উল্লেখপঞ্জী:-

- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, নবম সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৭, পুঃ- ৫৬ সঃ।
- শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা ১৯০৯ - ৫ দ্রঃ।

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু, বঙ্কিম রচনাবলী, (২য় খন্ড) সাহিত্য সংসদ, দ্বাদশ মুদ্রণ- আশ্বিন ১৪০১ - ১০ সঃ।
- বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত কলিকাতা, সাহিত্য আকাদেমী, প্রথম প্রকাশ - ১৩৮৮ ফাল্গুন, পুঃ- ৭ দ্রঃ।
- অরুণ নাম সম্পাদিত- হুতোম প্যাঁচার নকশা, কলিকাতা - ১৩৯৮, ৫/৬
- রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, প্রথম ডি. এম. সংস্করণ, ১লা বৈশাখ ১৩৯০ পূঃ
- প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত প্রাচীন কবিওয়ালার গান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫৮ পূঃ ২০৫ ।